এ সব মহল্লায়। স্বভাবতই আজ নাগালে পেয়ে তাকে জাপটে ধরে মহিলাদের পুঞ্জীভূত ভিড়। দু'বেলা হেঁশেল ঠেলা কুরুক্ষেত্রর জন্য চলতে থাকে অস্ত্রের আকুতি, অনুনয়–বিনয়, পারিতোষিকের লোভ। জানলায় উঁকি মারতেই দেখলাম মহিলা দাঁড়িয়ে বারঘরের চৌকো সিঁড়িতে, হাতে জংধরা পুরোনো ছুরি, তার লম্বা ফলা, ঘাম–ময়লা কাঠের হাতল। বার কতক ঘষতেই রোদে ঝিকিয়ে ওঠে পুরোনো শস্ত্র। মহিলা বুড়ো আঙুলে ধারখানা পরখ করেই সামনে উপবিষ্ট বিড়ালের দিকে তাক করে একবার খেলিয়ে নেন, 'দেখেছিস কেমন তকতকে, বেশ আলু কাটা যাবে এরপর।' বিড়াল কী বোঝে খোদায় মালুম, সন্ত্রস্ত লাফে উঠে যায় পাশের রোয়াকে। পিছু পিছু লোমশ লেজটা দুলতে থাকে শ্বেত পতাকার মতো।

মাস খানেক কেটে গিয়েছে। হপ্তার মাঝে কাজ–কাম নেই, বেকার যৌবনে আড়ি পেতে বসে রয়েছি জানলার পাশে। সকাল থেকেই ওদিকে আজ ব্যস্ততা তুঙ্গে। মহিলা ঘষে–মেজে স্নান সেরেছেন। গায়ে পাটভাঙা নতুন শাড়ি। দু'প্রস্ত ঝাঁট দেওয়া হয়ে গিয়েছে, বাইরে ডাঁই করে রাখা জঞ্জাল চলে গিয়েছে কর্পোরেশনের ঠেলায়। অন্যদিন উপরতলার ঝি এসে টুকটাক বাজার এনে দেয়। মহিলা আজ নিজেই বেরিয়েছিলেন, পেটমোটা থলে নিয়ে একরাশ শাক–মাছ উঠিয়ে এনেছেন কাকভোরে। ঝিটাকে লাগিয়েছেন ঘর পরিষ্কারের কাজে। চাদ্দিকে তকতকে মেঝে, ধূপের গন্ধ, নতুন পর্দা। চোখাচুখি হতে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ?' একঝলক টাটকা হাসি, 'ছেলে আসছে আজ'।

মেরেছেআবছা সন্ধে। বাসনের টুংটাং শব্দ, পর্দা ঠেলা সূক্ষ্ম সুগন্ধ। গুণধর পুত্র জমিয়ে বসেছে বারান্দার পুরোনো কেদারায়, হাফপ্যান্ট, কানে ফোন। আধা হিন্দি–আধা ইংরেজিতে বাতচিত চলছে শেয়ারের দরদাম নিয়ে। থাক থাক মাসলে পুষ্ট শরীর হাসির দমকে দুলে উঠছে ভিনভাষী চুটকিতে। হোয়্যাটস অ্যাপে টুং টাং মেসেজ আসছে অনবরত। মহিলা হালকা পায়ে ঘর–বার করছেন, অল্প দু'চার কথা, বাড়িয়ে দেওয়া চা–পকোড়া, জলের গ্লাস। মাঝে মাঝে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন ঠায়। চেয়ে রয়েছেন ছেলের দিকে, অপলকে, পিছন থেকে।

আলো নিভে গিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। শেষ দেখেছি মায়ে–পোয়ে খোশমেজাজে গল্প চলছে তিন–আট বারান্দায়। নাতি বড় হচ্ছে, 'উঁচু দরের ইংলিশ মিডিয়াম', 'দেদার খরচ'। বউয়ের 'গ্যাস্ট্রিক', ফুলে উঠছে লুচির মতো। 'নতুন প্রপার্টি' কেনা হচ্ছে 'রাজারহাটে'। এই 'পুরোনো বাড়ি'–টা এবার 'বেচে' দিলেই হয়। 'লোকেশন' ভালো, দাম উঠছে 'চড়চড়িয়ে'। 'বয়স হচ্ছে', 'একা থাকার' দরকার নেই, এবার চলে এলেই হয় 'বালিগঞ্জ'–এ। ইত্যাদি। বিড়ালটা রাস্তায় উবু হয়ে বসে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চিবিয়ে খাচ্ছে উদ্বৃত্ত হাড়–মাংস। কয়েক মাসে চেহারায় জেল্লা এসেছে, জোর বেড়েছে শ্বদন্তে। বাতাসে হালকা মৌরির গন্ধ, দূরে গলির মোড়ে প্রথম গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া।

মাঝরাত্তিরে অমানুষিক চিৎকারটা যখন ভেসে এল আমরা মেসে, তাস খেলছি পা ছড়িয়ে। একদৌড়ে পাশের বাড়ির কড়া নাড়লাম। বারান্দায় গায়ে জড়ানো স্ট্রিটলাইট। হলুদ ভেপারের ওম মেখে বিড়ালটা শুয়ে

ভেবেছিলাম হবে কোনও নিরীহ ঘরজামাই, চেহারায় থাকবে ভীতু দৈন্য, মেরুদণ্ড নুয়ে যাবে পাপের ভারে। এলেন যখন দশাসই গাড়ি, আপাদমস্তক ব্র্যান্ডেড আচ্ছাদন, কলপিত চুল, ঠোঁটের কোণে বিশ টাকার আগুন। জিম করা সুষম দেহ একলাফে গাড়ি থেকে নেমেই কোনওক্রমে মা'র পা ছুঁয়ে গটগটিয়ে ঢুকে গেলেন ভিতর পানে

ভদ্রলোককে দেখে আক্কেলগুড়ুম আমার। ভেবেছিলাম হবে কোনও নিরীহ ঘরজামাই, চেহারায় থাকবে ভীতু দৈন্য, মেরুদণ্ড নুয়ে যাবে পাপের ভারে। এলেন যখন দশাসই গাড়ি, আপাদমস্তক ব্র্যান্ডেড আচ্ছাদন, কলপিত চুল, ঠোঁটের কোণে বিশ টাকার আগুন। জিম করা সুষম দেহ একলাফে গাড়ি থেকে নেমেই কোনওক্রমে মা'র পা ছুঁয়ে গটগটিয়ে ঢুকে গেলেন ভিতর পানে। গাড়িখানা গলিতে আঁটল না, ড্রাইভার বড় রাস্তায় নিয়ে গেল পার্ক করতে। মিষ্টি থেকে শাড়ি, ছোট–বড় প্যাকেট নামল একডজন, থাক থাক র‍্যাপারে মোড়া নিপাট ভাঁজে। ঘাড় নাড়লাম, এ লোক জীবনে একের পর এক পেনাল্টি মিস করতে পারে শ্বশুরবাড়িটা একদম কর্নার থেকে গোল আরাম কেদারায়। দমকা পূবালি হাওয়া। সে হাওয়ায় একখানা ছায়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে, নিঃসাড়ে। এলোকেশী চুল, ক্ষীণকায় শরীর, পাণ্ডুর মিতবসনা। বেতো পা ছেঁচড়ে আসতে সময় লাগল বিস্তর। কাঁপা হাতে গেটের দরজা খুলে গেল হাট করে। হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে যাব, আটকে দিল দীর্ঘ হাত, অস্বাভাবিক দীর্ঘ। শিথিল আবছায়া কেঁপে উঠল ঈষৎ। ভেসে এল অপার্থিব কণ্ঠস্বর, 'ঘরে ঢুকে বাঁ দিকে সুইচবোর্ড। আলোটা জ্বালবে। ডানদিকে খাট। ওখানেই পড়ে আছে। পালসটা চেক করে দ্যাখো, মরল কিনা।'

অবশ আলোয় নাড়িস্রোত সুষুম্না ছুঁইয়ে নামার আগে চোখ চলে গেল তুলে ধরা হাতে। শিরা ওঠা প্রাচীন মুঠিতে তখনও ঝকমক করছে রক্তঝরা ছুরি।

অঙ্কন ঃ অভি

লেখা পাঠাতে হলে

- কাগজের একপিঠে পরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় বা টাইপ করে লেখা পাঠান নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা মেনে– প্রচ্ছদ কাহিনি (২০০০), গল্প (১৬০০), অণুগল্প (২০০), প্রথম (৭৫০), ভ্রমণ (৭৫০), কবিতা (অনধিক ১৪ লাইন)। প্রচ্ছদ কাহিনি ও ভ্রমণের লেখায় ছবি পাঠাতে হবে।
- ডাকে লেখা পাঠানোর ঠিকানা– রংদার রোববার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা– ৭০০০২৬
- লেখা ই–মেল– এ পাঠাতে মেল করুন rongdarrobbar@gmail.com। ওয়ার্ড ফাইল ও পিডিএফ দু'টোই পাঠাতে হবে।
- লেখা পাঠানোর সময়, ডাকে বা ই–মেল উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের পুরো নাম ঠিকানা পিনকোড– সহ ইংরেজিতে লিখে পাঠাতে হবে। ফোন নম্বরও উল্লেখ করা আবশ্যিক।
- ফোটো কপিতে পাঠানো লেখা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।
- লেখা পাঠানোর পর চারমাস অপেক্ষা করুন। তার মধ্যে ছাপা না হলে লেখাটি মনোনীত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

অণুগল্প

পুঁতব কোথায়

প্রদ্যুৎ রাজগুরু

প্রত্যুষা ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ছবি আঁকার প্রতি বেশ আন্তরিক বলা যেতে পারে। প্রতি বছর তাদের অঙ্কন পরীক্ষা হয়, স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে। আনন্দ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রতিবার ড্রইং পরীক্ষা দিতে যায়। পরীক্ষার শেষে প্রত্যুষা যখন বাড়ি ফেরে তখন সেই উচ্ছ্বাস আর আনন্দ বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। মেয়েটা আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। খুবই সংবেদনশীল। গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা।

প্রকৃতিপ্রেমী মন। এবার ড্রইং পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে সোজা জানালাটার কাছে যায় প্রত্যুষা। দশ বাই এগারো ফুট ভূমিহীন আবাসনের ছোট ঘরের গুমোট পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে।

নীল আকাশের দিকে অভিমানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ এক দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে মাকে। ডুকরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা, বাবাকে বলো গ্রামের বাড়ি ফিরে যেতে। আমার হাতে প্রতিবছর একটা করে অবোলা প্রাণ অচিরেই মারা যায়। যে প্রাণটা আমার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে, সেই প্রাণটাকেই আমি হত্যা করি। প্রত্যুষার এই ধরনের দার্শনিক কথাবার্তায় কিছুটা ঘাবড়ে যায় তার বাবা, মা। একমুঠো মাটি আর দু'টি কচিপাতা বুকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে প্রত্যুষা। ঘটনা হল, আঁকার পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সকল ছাত্রছাত্রীকে একটা করে চারা গাছ দেওয়া হয়।

আর প্রতিবছর সেই চারাগাছ বাড়ি নিয়ে আসে প্রত্যুষা। কিন্তু, আজ আর সেই চারা গাছ প্রত্যুষা বাড়ি আনেনি। শুধু এক মুঠো মাটি আর দু'টি কচিপাতার প্রলেপ দিয়ে তার রক্তাক্ত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করে।

শুধু একটি বছর

গৌতম মজুমদার

হ্যালো!

–হ্যাঁ বলছি দাদা। না রে ভাদ্রতে আর যাওয়া হল না।

শাশুড়ি বলেছেন, পায়ে মুজো পরে থেকো তা হলেই হবে ভাদ্র শ্রাবণ আমরা মানিনে গো।

–তবে তোর শাশুড়ি শনি, মঙ্গল, বেস্পতি মানে কেন? বলতে পারিস না বোকা মেয়ে।

–না না আমি কি আর মুখের উপর বলতে পারি? পারব, আর কিছু কিছুদিন যাক।

–তুই বোকা মেয়ে, বড় ভয় পাস।

–তুই কী ভাবিস দাদা — আমি বোকা মেয়ে? জানিস কী করি — ভাতের ফ্যান ঝরানোর সময় কিছু ভাত ফ্যানের সঙ্গে ফেলে দি। পরে ওই ভাত লুকিয়ে খেয়ে ফেলি। সকালের জলখাবারে ভাত না খেয়ে আমরা কখনও থেকেছি, বল? একদিন দেখে ফেলেছে। — বলছে বউমা কী খাও, ফ্যান? — বাঃ বেশ, একটু নুন দিয়ে খেও, ফ্যানে ভিটামিন আছে। তা দুপুর হতেই বা কি বাকি, স্নান সেরে খেলেই পারতে।

বোঝ দাদা — ভগবান কৃপা করে এক কৃপণ ঘরেই ফেলল।

–কে অক্ষয়? ওর কথা বলছিস। ও তো কথাই বলে না, সারাদিন ব্যবসার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বেশি কথা বললে নাকি আয়ু ক্ষয় হয়।

একদিন মানে গত রবিবার বলেছিলাম, একটা ভালো সিনেমা এসেছে, অনেকদিন হল সিনেমা দেখা হয় না। বাপের বাড়িতে কেব্‌লে ভাল সিরিয়াল দেখে সময়টা কেটে যেত। এখানে তো আর মানে তোমাদের বাড়িতে কেব্‌ল, ডিস কোনওটাই নেই। কেব্‌ল লাইন নিয়ে নাও না, তা হলে দু'একটা ভালো বই দেখা যায়। মায়েরও ভালো লাগবে। সারা দুপুরটা কী করি বলো তো! ও হু–হ্যাঁ কিছুই বলে না শুধু বলে, তোমার ওই বইয়ের চাইতে এই বইটা ইমপর্টেন্ট — পকেট থেকে ব্যাংকের পাশবইটা দেখিয়ে বলে।

দাদা! আর একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আগে বলেছিলাম না — পাশের ফ্ল্যাটের দিদি মাঝেমধ্যে এটা ওটা রেঁধে খেতে দিয়ে যেত। আজকাল আর রেঁধে কিছুই দেয় না।

–না না, ঝগড়াঝাঁটি ও সব কিছুই না — ওঁর স্বামী আমাদের দোকান থেকে ইন্সটল্‌মেন্টে একটা ফ্রিজ কিনেছে।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক